বিশ্ববিজয়ী এক শক্তিধর শাসক

যুল কারনাইন

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

খতীবে আযম ফাউন্ডেশন

বিশ্ববিজয়ী এক শক্তিধর শাসক: যুল কারনাইন

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
অধ্যাপক, ওমর গণি এম. ই. এস. কলেজ চট্টগ্রাম
E-mail: drkhalid09@gmail.com

উপাত্ত সম্পাদনা
মু. সগির আহমদ চৌধুরী

প্রকাশক
মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী
খতিবে আযম ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
কাজী যুবাইর মাহমুদ

প্রাপ্তিস্থান
হাবিবিয়া বুক ডিপো
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা
আল-মানার লাইব্রেরী
শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৫খ

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

Dhul Qarnain: A world conqurer and mighty ruler:
Written in Bengali by Dr. A. F. M. Khalid Hossain
Published by Khatib-i-Azam Foundation, Chittagong, Bangladesh,
Aug. 2015

সূচিপত্র

নামকরণ	০৫
হযরত যুল কারনাইন কি নবী ছিলেন?	০৬
হযরত যুল করনাইনের বিশ্ববিজয়	১২
সূর্যের উদয়াচলে হযরত যুল কারনাইন	১৪
দু'পর্বত প্রাচীরে যুল করনাইন	১৫
ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গ	১৮
যুল কারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?	২১
মূল্যায়ন	২৪
গ্রন্থপঞ্জি	২৬

বিশ্ববিজয়ী এক শক্তিধর শাসক

যুল কারনাইন

যুল কারনাইন প্রাচীন আরবের একজন দীনদার, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী ও শক্তিধর বাদশাহ। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা-প্রদত্ত সর্বপ্রকার সাহায্য, অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু দেশ, বহু নগর-প্রান্তর নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এসব দেশের যালিম ও কাফিরদের তিনি কঠোর হাতে দমন করে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন। দীনী হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে তিনি সেসব দেশে সুবিচার ও ইনসাফের শাসন কায়েম করেন। আল্লাহ তায়ালা-প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বের হন। তিনি পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন; পাশ্চাত্যে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানে তিনি দু'পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি বিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দেন। ফলে ইয়াজূজ-মাজূজের লুটতরাজ হতে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।[১]

যুল কারনাইন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۝

'(হে রাসূল!) তারা আপনাকে যুল কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আমি আপনার নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।'[২]

---

[১] (ক) আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, খ. ১৫, পৃ. ৩৬৮–৩৭১; (খ) ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ১২২–১২৩; (গ) আল-মহল্লী ও আস-সুয়ূতী, *তাফসীরুল জালালাইন*, পৃ. ৩৯৩–৩৯৫; (ঘ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৬১৬–৬১৭

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৮৩–৮৪

৫ হযরত যুল করনাইন

ইসরাইলী বিবরণ অনুযায়ী ১৬০০ বছর দুনিয়াতে জীবিত থেকে হযরত যুল কারনাইন দীনের তাবলীগ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সাইয়িদ মাহমূদ আল-আলূসী (রহ.) বলেন যে, হযরত যুল কারনাইন ৫০০ বছর রাজত্ব করেন।[১]

নামকরণ

শায়খ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (রহ.)-এর মতে যুল কারনাইনের নাম مَرْزُبَانُ (মারযুবান)। পিতার নাম: مَرْدُبَةَ الْيُوْنَانِيُّ (মারদুরা)। তাঁর বংশধারা يُوْنَانَ بْنِ يَافِثَ بْنِ نُوْحٍ [ইউনান ইবনে ইয়াফিস ইবনে নূহ (আ.)]-এর সাথে সম্পৃক্ত।[২]

আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) বলেন,

وَالْإِسْكَنْدَرُ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ بْنِ مَعْدٍ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مِنْ حِمْيَرَ وَأُمُّهُ رُوْمِيَّةٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْفَيْلَسُوْفِ لِعَقْلِهِ.

'যে মুমিন ইসকান্দারের প্রসঙ্গ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনুয যাহ্হাক। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে এ তথ্য বর্ণিত। হযরত যুল কারনাইন হিময়ার গোত্রভুক্ত এবং তাঁর মাতা রোম দেশীয়। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে তাঁকে দার্শনিক-তনয় বলা হয়।'[৩]

যুল কারনাইন নামকরণের পিছনে মুফাসসিরীন ও ইতিহাসবিদদের নানা অভিমত রয়েছে। الْقَرْنُ (কার্ন) অর্থ: শিঙ। ذُو الْقَرْنَيْنِ (যুল করনাইন)-এর অর্থ: দাঁড়ায় দু'শিঙের মালিক অথবা অধিকারী। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ, তাই যুল কারনাইন (দু'গুচ্ছঅলা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন, রোম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন বলে তাঁকে যুল কারনাইন বলা হয়। কেউ এমনও বলেছেন যে, তাঁর মাথায় শিঙয়ের অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল। হযরত আলী (রাযি.) হযরত যুল কারনাইন নামকরণের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন যে,

---

[১] (ক) ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৯; (খ) আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী*, খ. ৮, পৃ. ৩৪৬

[২] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১১, পৃ. ৪৫

[৩] আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, ক. ১৫, পৃ. ২৩৩

তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দান করেন, কিন্তু লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। অবাধ্য লোকেরা তাঁর মাথার ডান পাশে এমন জোরে আঘাত করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি প্রাণ হারান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দ্বিতীয়বার যিন্দা করেন। তাঁর জাতির লোকেরা এবার তাঁর মাথার বাম পার্শ্বে আঘাত হানে। ফলে তিনি শাহাদতবরণ করেন। আল্লাহ তাঁর নাম রাখেন যুল কারনাইন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিমের প্রান্তসীমা পরিভ্রমণ করেন সেহেতু তাঁকে যুল কারনাইন নামে অভিহিত করা হয়।[১]

কোন কোন গবেষক মনে করেন, যুল কারনাইন মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়ে অভিজাত বংশের ছিলেন। কেউ বলেন, যুদ্ধ করার সময় তিনি দু'হাতে অস্ত্র চালনা করতেন এবং যাহির ও বাতিন দু'ইলমের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে যুল কারনাইন বলা হয়।[২]

বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-বাগাবী (রহ.) ও সাইয়িদ মাহমূদ আল-আলূসী (রহ.) এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মতামত পেশ করেন, যুল কারনাইন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সূর্যের দু'প্রান্ত ধরে ফেলেছেন। তাঁর সুন্দর দু'টি যুলফী ছিল; তিনি আলোকময় দেশেও (শ্বেত বর্ণের জনগোষ্ঠী) গেছেন, অন্ধকারময় দেশেও (কৃষ্ণ বর্ণের জনগোষ্ঠী) প্ররিভ্রমণ করেছেন। এসব কারণে তাঁকে যুল কারনাইন বলা হয়।[৩]

যুল কারনাইন কি নবী ছিলেন?

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক যুল কারনাইন পদব্রজে মক্কা মুকাররামা আগমন করলে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মুখোমুখী হতেই তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সালাম দেন এবং তাঁর সাথে করমর্দন করেন। বলা হয়ে থাকে, তিনিই সর্বপ্রথম করমর্দনকারী ব্যক্তি। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জন্য দু'আ করেন এবং তাঁকে কিছু উপদেশ দান করেন। যুল কারনাইন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তাওয়াফ ও কুরবানী সম্পন্ন করেন।[৪]

---

[১] (ক) আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, খ. ২, পৃ. ৭৪৩; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১১, পৃ. ৪৬-৪৮; (গ) ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৬; (ঘ) আহমদ আলী সাহারানপুরী, *আল-হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৪৭২, টীকাঃ ৮

[২] আল-বুস্তানী, *দায়িরাতুল মাআরিফ*, খ. ৮, পৃ. ৪১১

[৩] (ক) আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২১২; (খ) আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী*, খ. ৮, পৃ. ৩৪৬

[৪] ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ১২৩-১২৮

শায়খ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন,

أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَجَدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَبْنِيَانِ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَفْهَمَهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: نَحْنُ عَبْدَانِ مَأْمُورَانِ، فَقَالَ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا؟ فَقَامَتْ خَمْسَةُ أَكْبُشٍ، فَشَهِدَتْ، فَقَالَ: قَدْ صَدَقْتُمْ.

'যুল কারনাইন যখন মক্কায় এসেছিলেন তখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ কাজে ব্যস্ত দেখতে পান। তিনি তাঁদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর জবাবে বলেন, আমরা উভয়ই (এ ক্ষেত্রে আল্লাহর) নির্দেশপ্রাপ্ত বান্দা। তিনি জানতে চাইলেন, একথার প্রমাণ কী? এতে ৫টি দুম্বা জাতীয় পশু দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। অতঃপর তিনি বলেন, আপনারা সত্য বলেছেন।'[১]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আর বরকতে যুল কারনাইন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত পরিভ্রমণ ও দেশজয় করেন এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন।[২]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহ.) ও হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) যুল কারনাইন নবী ছিলেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩]

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ (আমি বললাম, হে যুল কারনাইন!)[৪] আল্লাহ তা'আলার এ সম্বোধন দ্বারা যদি ধরে নেওয়া যায়, তিনি নবী ছিলেন তা হলে আপত্তির কিছু নেই। কারণ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তা বলা হয়েছে। আর যদি তাঁর নুবুওয়াত স্বীকার করা হয়, তা হলে মনে করতে হবে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় তাঁকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন– বর্ণিত আছে, হযরত খিযির (আ.) তাঁর সাথী ছিলেন। অধিকন্তু এটা নুবুওয়াতের ওহী না হয়ে আভিধানিক অর্থে ওহী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ[৫] (হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার নিকট ওহী পাঠিয়েছি)[৫] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। অথচ তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন না।

---

[১] (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ২৩১, হাদীস: ১২৩১; (খ) আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ৩৮২, হযরত ইলবা ইবনে আহমর (রহ.) সূত্রে বর্ণিত

[২] শাব্বির আহমদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী*, পৃ. ৪০৪

[৩] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *তারজুমানুল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৪৫৩

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৮৬

[৫] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাসাস*, ২৮:৭

শায়খ আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী (রহ.) *আল-বাহরুল মুহীত* নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এখানে যুল কারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ সাধারণত নুবুওয়াতের ওহী ছাড়া দেওয়া যায় না। কাশফ, ইলহাম অথবা কোন উপায়ে এটি হতে পারে না। সুতরাং যুল কারনাইনকে নবী মানতে হবে অথবা তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।[১]

শায়খ মুজাহিদ ইবনে জাবের আল-মক্কী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরী যুল কারনাইনকে সম্বোধন করেন এবং ওহী প্রেরণ করেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী ছিলেন ও ওহীয়ে ইলাহীর বাহক ছিলেন।[২]

শায়খ আবু মুহাম্মদ বাগাবী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে যে, যুল কারনাইন নবী ছিলেন না। ওহীর অর্থ হচ্ছে এখানে ইলহাম যা আল্লাহর ওলীদের নিকট আসে।[৩]

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) এ প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত কোন পয়গাম্বরের মাধ্যমে তিনি এ বাণী লাভ করেন। বনী ইসরাঈলের কোন পয়গাম্বরকে তাঁর সাথে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।[৪]

শায়খ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে,

بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْبَعْثُ عَلَىٰ غَيْرِ رِسَالَةِ النُّبُوَّةِ.

'যুল কারনাইন আল্লাহর পক্ষ হতে একটি জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এ কথা সত্য, তবে তাঁকে নুবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।'[৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

«وَمَا أَدْرِيْ ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا».

'যুল কারনাইন নবী কিনা তা আমি জানি না।'[৬]

---

[১] (ক) আবু হাইয়ান আল-আনদালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, খ. ৭, পৃ. ২১৮–২২৪; (খ) আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী, *তাফসীরে মাজিদী*, পৃ. ৬১৯

[২] কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৬, পৃ. ৬৪–৬৫

[৩] আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, দ খ. ৩, পৃ. ২১২–২১৩

[৪] আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২১২–২১৩

[৫] আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩

[৬] (ক) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস: ২১৭৪; (খ) আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩

যুল কারনাইন সম্পর্কে হযরত আলী (রাযি.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যুল কারনাইন নবীও নন, বাদশাহও নন। তিনি এমন এক পুণ্যবান আল্লাহর বান্দা যিনি আল্লাহকে ভালোবাসতেন। আল্লাহও তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁকে অনেক অত্যাশ্চর্য বরকত দান করেন। মেঘ ও বাতাসকে তাঁর হুকুমের অধীন করে দেওয়া হয়, ফলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি পূর্ব হতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হতে পূর্ব প্রান্ত পরিভ্রমণ করতে পারতেন। রাত্রি ও দিন তাঁর জন্য সমান। অন্ধকার রাতেও তিনি আলোকরশ্মির সাহায্যে চলাফেরা করতে পারতেন। সমস্ত সড়ক ও জনপদ থাকত তাঁর জন্য উন্মুক্ত। মৌসুমের পরিবর্তনের ফলে তাঁর যাত্রাপথ বিঘ্নিত হত না।[১]

যুল কারনাইন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা জানতেন এবং প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান ছিল তাঁর নখদর্পণে। জমিনের সমস্ত ছোট-বড় নিদর্শনসমূহের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেন। যে জনগোষ্ঠীর সাথে তিনি যুদ্ধ করতেন তিনি তাঁদের ভাষাও জানতেন এবং সে ভাষায় তিনি কথোপকথন করতেন।[২]

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, সমগ্র দুনিয়ায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী ৪জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মুমিন দু'জন কাফির। মুমিন দু'জন হলেন হযরত সুলায়মান (আ.) ও যুল কারনাইন এবং কাফির দু'জন হলেন নমরুদ ও বুখতে নাসার। আশ্চর্যের বিষয় যে, যুল কারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেন এবং প্রতি যুগের যুল কারনাইনের সাথে সিকান্দার (Alexander) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।[৩]

ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রিক বীর আলেকজান্ডারকে অনেকে কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন হিসেবে অভিহিত করেন। আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী (রহ.) *আল-বাহরুল মুহীতে* এবং ইমাম মাহমুদ আল-আলূসী (রহ.) *রূহুল মা'আনী* নামক তাফসীরে মেসডোনিয়ার আলেকজান্ডারকে (সিকান্দারে রুমী আল-মাকদূনী) কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[৪] কিন্তু ইতিহাসবিদ হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) উপর্যুক্ত অভিমত খণ্ডন

---

[১] (ক) আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, খ. ২, পৃ. ৭৪৩; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১১, পৃ. ৫২; (গ) ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ১২৩; (ঘ) আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩

[২] ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৬

[৩] (ক) আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, খ. ২, পৃ. ৭৪৩; (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৬১৭-৬১৮

[৪] (ক) আবু হাইয়ান আল-আনদালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, খ. ৭, পৃ. ২১৯-২২০; (খ) আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী*, খ. ৮, পৃ. ৩৪৬-৩৪৯

করে বলেন, গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ও কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন পৃথক দু'ব্যক্তি। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ায়* গ্রিসের আলেকজান্ডারের বংশতালিকা উপস্থাপন করেন, যা উপরে গিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে মিলে যায়। হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন,

فَأَمَّا ذُو الْقَرْنَيْنِ الثَّانِيْ فَهُوَ إِسْكَنْدَرُ بْنُ فِلِبْسَ الْمَقْدُوْنِيُّ الْيُوْنَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بَانِيْ إِسْكَنْدَرِيَّةَ الَّذِيْ يُؤَرِّخُ بِأَيَّامِهِ الرُّوْمُ، وَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْأَوَّلِ بِدَهْرٍ طَوِيْلٍ، كَانَ هَذَا قَبْلَ الْمَسِيْحِ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَانَ أَرِسْطَاطَالِيْسُ الْفَيْلَسُوْفُ وَزِيْرَهُ، وَهُوَ الَّذِيْ قَتَلَ دَارَا بْنَ دَارَا، وَأَذَلَّ مُلُوْكَ الْفُرْسِ وَأَوْطَأَ أَرْضَهُمْ. وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْمَذْكُوْرَ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الَّذِي كَانَ أَرِسْطَاطَالِيْسُ وَزِيْرَهُ، فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ خَطَأٌ كَبِيْرٌ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ طَوِيْلٌ كَثِيْرٌ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَانَ عَبْدًا مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَلِكًا عَادِلًا، وَكَانَ وَزِيْرُهُ الْخَضِرَ، وَقَدْ كَانَ نَبِيًّا عَلَىٰ مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا. وَأَمَّا الثَّانِيْ: فَكَانَ مُشْرِكًا، وَكَانَ وَزِيْرُهُ فَيْلَسُوْفًا، وَقَدْ كَانَ بَيْنَ زَمَانَيْهِمَا أَزْيَدُ مِنْ أَلْفَيْ سَنَةٍ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا، لَا يَسْتَوِيَانِ وَلَا يَشْتَبِهَانِ.

'দ্বিতীয় যুল কারনাইন ছিলেন ফিলিপের পুত্র সিকান্দার (আলেকজান্ডার) যিনি মাকদূনী, ইউনানি ও মিসরী নামে পরিচিত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং রোমের ইতিহাস তাঁর যামানায় খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে। তিনি প্রথম সিকান্দার হতে সুদীর্ঘ কাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর ৩০০ বছর পূর্বে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। দারাকে তিনি হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বিপুল এলাকা করায়ত্ত করেন। অনেকের বিশ্বাস যে, উভয়ই এক এবং তিনিই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন যার মন্ত্রী এরিস্টটল। এটা মূলত বিরাট বিভ্রান্তি ও দীর্ঘমেয়াদি বিতর্কের অন্যতম কারণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন নেককার, মুমিন ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ যার মন্ত্রী ছিলেন হযরত খিযির (আ.)। তিনি নবী ছিলেন বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মুশরিক যার মন্ত্রী এরিস্টটল। দু'জনের মধ্যখানে ২

হাজার বছরের অধিক ব্যবধান। কোথায় ইনি আর কোথায় তিনি। সুতরাং সিকান্দার বা যুল কারনাইন যে একটি ব্যক্তি নন এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।'[১]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, যুল কারনাইম নামে পরিচিত সিকান্দার আল-মাকদূনী (Alexander of Macidonea) মুশরিক ও যালিম ছিলেন। নিজেকে খোদা দাবি করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি, এমনকি শত্রুর বক্ষে বর্শাবিদ্ধ করে তিনি আনন্দ পেতেন। শরীরিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাঁর বন্ধুগণ যখন আর্তচিৎকার করত তখন তিনি তাচ্ছিল্যভরে মুচকি হাসতেন। প্লুটারক (Plotark) বলেন, মানুষ শিকারের মাধ্যমে স্বস্তি ও সুখানুভূতি লাভ করার পুরাতন অভ্যাস ছিল তাঁর। প্যাসারগ্যাডা (Pasargadae) দখল করার পর ১ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডের সহায়-সম্পত্তি তিনি লুট করেন এবং শহরের সব পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে নারীদের দাসীতে পরিণত করেন।[২]

পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহওয়ালা ও প্রজারঞ্জক বাদশাহ। মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী ও মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী পারস্য ও 'মিডিয়ার রাজা সাইরাস (কায়খসরু, মৃত্যুঃ ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্ব) কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সাইরাস প্রাচীন কালের খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিযান পরিচালনায় যুলুম ও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান।[৩]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার বলেন, ব্যাবিলনে যখন তিনি অভিযান পরিচালনা করলেন, তখন ইহুদিরা পারস্যবাসীদের মুক্তিদাতা ও একেশ্বরবাদী বলে শ্লোগান দিতে থাকে। এতে সন্দেহ নেই যে, সাইরাস জেরুজালেম ও ইহুদিদের উপসনালয় হায়কাল ইহুদিদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন এবং তাদেরকে ফিলিস্তিন প্রত্যাবর্তনে অনুমতি প্রদান করেন।[৪]

মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী এ প্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে সাইরাসের রাজ্যসীমা উত্তরে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুশমন পর্যন্ত তাঁর ন্যায়-

---

[১] (ক) ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ১২৫–১২৬; (খ) আহমদ আলী আস-সাহারানপুরী, *আল-হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৪৭২, টীকাঃ ৮

[২] ***The Encyclopaedia Britannica***, v. l, p. 493-495

[৩] হিফযুর রহমান সিওহারবী, *কাসাসুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১৩৪

[৪] ***The Encyclopaedia Britannica***, v. vi, p. 752

ইনসাফের প্রশংসা করেন। বাইবেলেন বর্ণনা এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি অবশ্যই খোদাভীরু বাদশাহ ছিলেন, যিনি বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর ইবাদত করার শর্তে ব্যাবিলনের বন্দিদশা হতে মুক্তি দান করেন এবং লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের জন্য বায়তুল মাকদিসে দ্বিতীয় হায়কালে সুলায়মানী নির্মাণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চয় স্বীকার করতে পারি যে, পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে যত বিশ্ববিজেতা অতিবাহিত হয়েছেন তাঁদের তুলনায় সাইরাসের মধ্যে যুল কারনাইনের অধিকাংশ নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাঁকে যুল কারনাইন বলার জন্য আরও অধিকতর প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে যত নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে তা অন্য কোন বিশ্ববিজেতার তুলনায় সাইরাসের মধ্যে অধিকতর পরিদৃষ্ট হয়।

সাইরাস প্রাচীন ইরানের শাসক ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৯ সালের কাছাকাছি তাঁর উত্থানকাল। অল্পদিনের মধ্যে তিনি মিডিয়া ও লিডিয়ার (Asia Minor) রাজত্বসমূহ করায়ত্ব করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ব্যাবিলন জয় করেন। এরপর কোন শক্তি তাঁর যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সাহস করেনি। তাঁর দেশ জয়ের ধারাবাহিকতা বর্তমান তুর্কিস্তান হতে একদিকে মিসর ও লিবিয়া, অপর দিকে থ্রেস ও মেসিডোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে তাঁর সাজ্যসীমা কাফকাস (ককেশাস) রাজত্ব ও খাওয়ারিয্ম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কার্যত তৎকালীন পুরো সভ্য জগত তাঁর প্রভাবাধীন ছিল।[১] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নিশ্চিতভাবে সাইরাসকে কুরআনে বর্ণিত যুল করনাইন হিসেবে চিহ্নিত করেন।[২]

যুল করনাইনের বিশ্ববিজয়

যুল করনাইনের বিশ্ববিজয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

---

[১] মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৪

[২] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *তারজুমানুল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৪৬৩

'অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল। চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমনের স্থানে পৌছল তখন সে সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, হে যুল কারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। সে বলল, যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতএব সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।'[১]

যুল কারনাইন আল্লাহর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পশ্চিম প্রান্তের এমন এক সমুদ্র সৈকতে পৌছেন যেখানে সামনে কৃষ্ণবর্ণের পানি ও কাদা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। অথৈ জলাশয়ের ওপারে কোন জন-মানব বা বন-জঙ্গলের চিহ্ন নেই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) বলেন, দুনিয়ার আবাদী কত দূর বিস্তৃত তা দেখার জন্য যুল কারনাইন ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি পশ্চিমের সেই প্রান্তে পৌছেন যেখানে কেবল জলাভূমি। মানুষ ও নৌযান সেখানে চলাচল করতে পারে না।[২] যুল কারনাইন পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের কিনারায় পৌছেছিলেন যেখানে প্রচুর দ্বীপ রয়েছে।[৩]

জলাশয়ের নিকট হযরত যুল কারনাইন একটি জনগোষ্ঠীর দেখা পেলেন। পশুর চামড়ার পোশাক-পরিহিত এসব মানুষ ছিল কাফির। সমুদ্র তটে যেসব মৃত মাছ ও পশু ভেসে আসত সেসবই ছিল তাদের খাদ্য। হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, পঙ্কিল জলাশয়ের সন্নিকটে একটি বড় শহর ছিল, যার প্রাচীরের দরজার সংখ্যা ১২ হাজার।[৪]

আল্লাহ তা'আলা যুল কারনাইনকে ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি জলাশয়ের সন্নিহিত জনগোষ্ঠীকে ইচ্ছা করলে তাওবার মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। যদি তারা ঈমানের দাওয়াত কবুল করে তা হলে তাদেরকে হিদায়াতের পথ নির্দেশনা দেবেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের পরিচালিত করবেন। যদি তারা ঈমান কবুল করতে সম্মত না হয় তা হলে তিনি তাদেরকে বন্দী করতে পারবেন, শাস্তি দিতে পারবেন। যুল কারনাইন

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৮৫–৮৮

[২] শাব্বির আহমদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী*, পৃ. ৪০৪

[৩] আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী*, খ. ৮, পৃ. ৩৫২

[৪] ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৮

প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেন। শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দান করে তাদেরকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন।[১] যুল কারনাইন দুর্বল ও নিরীহ মানুষদের রক্ষা করেন এবং উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বিনীত ও অবাধ্যদের শাস্তি প্রদান করেন।[২]

শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, দেশ বিজয়, সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ন্যায়বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপকরণসমূহ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে দান করা হয়েছিল। এক কথায় সে যুগে যেসব বিষয় একজন ধর্মপ্রচারক ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রয়োজন ছিল সব কিছু ছিল তাঁর নাগালের মধ্যে। সর্বপ্রথম তিনি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছানোর উপকরণসমূহ কাজে লাগান।[৩]

সূর্যের উদয়াচলে যুল কারনাইন

যুল কারনাইনের পূর্বে দিগন্ত সফর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

'আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল, তা এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য-তাপ হতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এটিই, তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি।'[৪]

অতএব যুল কারনাইন অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিরাট বহর সহকারে পূর্ব দিগন্তে পৌঁছে দেখতে পান, পঙ্কিল জলাশয় ভেদ করে সূর্য উদিত হচ্ছে। সেখানে তিনি এমন এক জাতিকে দেখেন যারা উলঙ্গ, হিংস্র ও উন্মুক্ত প্রান্তরে যাযাবরের ন্যায় বসবাস করছে। তাদের কোন পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর ও তাঁবু ছিল না। সেখানকার মাটি ঘর নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা ছিল কাফির।

---

[১] (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *জাত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৬, পৃ. ৬৪–৬৫; (খ) আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী, *তাফসীরে মাজিদী*, পৃ. ৬১৯; (গ) শাব্বির আহমদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী*, পৃ. ৪০৪

[২] Abdullah Yousuf Ali, ***The English Translation and Meanings of the Holy Quran***, P. 754, Note No. 2431

[৩] (ক) আবু হাইয়ান আল-আনদালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*খ. ৭, পৃ. ২১৯–২২০; (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৬২১

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৮৯–৯১

যুল কারনাইন তাদের সাথে এমন আচরণ করেন, যেমন পশ্চিম দিগন্তের লোকদের সাথে করেছিলেন।[১]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, পশ্চিম প্রান্ত হতে পূর্ব দিগন্তে যাওয়ার পথে যেসব জাতির দেখা হত তিনি তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। যদি তারা দাওয়াত কবুল করত তবে ভালো, অন্যথায় তিনি তাদের সাথে লড়াই করতেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তারা পরাজিত হলে যুল কারনাইন বিজিতদের সম্পত্তি, গবাদি পশু ও কর্মচারী নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন এনে সম্মুখপানে অগ্রসর হতেন। এভাবে পথ চলতে চলতে তিনি সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছেন। সেখানে দেখা গেল এক বিরাট জনবসতি। গাছ-পালাবিহীন এ প্রান্তরে বসবাসকারী মানুষগুলো দিগম্বর ও জঙ্গী। গায়ের বর্ণ লাল, দৈহিক আকারে খাটো। সামুদ্রিক মাছই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেন, এসব মানুষ সূর্যোদয়ের সময় মাটির গর্তে অথবা পানির মধ্যে সুড়ঙ্গে চলে যেত, সূর্যোদয়ের পর মাটির গর্ত অথবা পানি হতে উঠে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করত। এসব লোকের কান ছিল বড় বড় এবং তাদের সাথে একটি করে বাচ্চা ও বিছানা থাকত। ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, এ এলাকায় কোন পাহাড়-পর্বত নেই। দূর অতীতে এক একটি সেনাদল এখানে এসে হাযির হলে স্থানীয় জনগণ তাদেরকে বলল, সূর্যোদয়ের সময় তোমরা এখানে থাকবে না। জবাবে তারা বলল, আমরা রাতের মধ্যেই এ এলাকা ত্যাগ করব। কিন্তু বল সেসব উজ্জ্বল হাড়ের স্তূপ কি করে এখানে এল? তারা জবাব দেয়, কিছুদিন পূর্বে এখানে একটি সেনাদল আসে, সূর্যোদয়ের সময় তারা অবস্থান করেছিল, ফলে সব লোকেরই মৃত্যু ঘটে। এসব হাড়গোড় তাদেরই।[২]

দু'পর্বত প্রাচীরে যুল কারনাইন

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ
قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى
اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

---

[১] (ক) আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, খ. ২, পৃ. ৭৪৫; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১১, পৃ. ৫৩

[২] (ক) আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, খ. ১৫, পৃ. ৩৮২; (খ) ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৯

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا
جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

'আবার সে এক পথ ধরল, চলতে চলতে সে যখন দু'পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা কোন কথা বুঝার মতো ছিল না। তারা বলল, হে যুল কারনাইন! ইয়াজূজ মাজূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবেন? সে বলল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়ে দেব। তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আন। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দু'পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন এটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বলল, তোমরা গলিত তাম্র আন, আমি তা ঢেলে দেই এর ওপর। এরপর তারা (ইয়াজূজ ও মাজূজ) তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে পারল না।'[১]

যুল কারনাইন উত্তর দিকে যাত্রা করে যে পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছেন তা ছিল আরমেনিয়া ও আযারবাইজানের সন্নিহিত মঙ্গোলীয় ভূখণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্ত।[২] হযরত যুল কারনাইন সেখানে যে জাতিগোষ্ঠীর দেখা পেলেন তারা বিশেষ একটি ভাষায় কথা বলত। ফলে তারা অন্য মানুষের ভাষা বুঝতে পারত না এবং অন্যরাও তাদের ভাষা বুঝত না। আল্লামা আয-যামাখশারী (রহ.) বলেন যে, তারা বোবার মতো ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলত।[৩] কিন্তু আল্লাহ তায়ালা-প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যুল কারনাইন তাদের ভাষা ও বাকরীতি বুঝতে সক্ষম হন। শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-বাগাবী (রহ.) বলেন, যুল কারনাইন দোভাষীর মাধ্যমে তাদের সাথে কথোপকথন করেন।[৪]

স্থানীয় জনগণ পর্বতের মধ্যখানে একটি শক্ত দেওয়াল তৈরি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুল কারনাইনকে বিপুল পরিমাণ লৌহের ওপর কয়লা, কয়লার ওপর লাকড়ি, লাকড়ির ওপর লৌহখণ্ড এভাবে স্তরের ওপর স্তর তৈরি করে হুকুম

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৯২–৯৭

[২] আবু হাইয়ান আল-আনদালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, খ. ৭, পৃ. ২২৪

[৩] আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, খ. ২, পৃ. ৭৪৬

[৪] আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২১৪

দেন আগুন ধরে ফুঁক দিতে থাক। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দহনে লৌহপিণ্ড যখন লোহিত অঙ্গারের বর্ণ ধারণ করল তখন তিনি তাম্র আনার হুকুম দেন। জনগণ তাম্রখণ্ড এনে দিলে তিনি তাম্র পিণ্ডগুলো জ্বলন্ত লৌহের ওপর ঢেলে দেন। এভাবে লৌহখণ্ড গলিত তাম্রের সংমিশ্রণে পর্বতশৃঙ্গসম এক শক্তিশালী প্রাচীর রচিত হয়ে গেল। ইয়াজূজ-মাজূজ নামক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতির পক্ষে এ সুকঠিন প্রাচীর অতিক্রম ও ভেদ করা অসম্ভব হয়ে গেল। ফলে তাদের ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হতে পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণ রেহাই পেল। মাওলানা আবদুল মাজিদ দারিয়াবাদী (রহ.) বলেন, যুল করনাইনের সাথে প্রাচীর নির্মাণে পারদর্শী একদল বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ছিলেন।[১]

শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-বাগাবী (রহ.) লিখেছেন, যুল কারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১২০০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ১০০ হাত।[২] প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর যুল কারনাইন আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এ প্রাচীর যে একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারও ইঙ্গিত দেন। কারণ আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ছাড়া দুনিয়ার কোন সৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

'সে (যুল কারনাইন) বলল, এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'[৩]

এখানে প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি ৩ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:

১. যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা এ প্রাচীন বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন অথবা
২. কিয়ামতের দিনই আল্লাহ এ প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন অথবা
৩. ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাবের সময় এটা ধ্বংস করে দিতে পারেন।[৪]

ইতিহাসবিদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.), হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) ও ইয়াকূত আল-হামাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) আযারবাইজান জয় করার পর ২২ হিজরী সালে সুরাকা ইবনে আমরকে আবুল আবওয়াবে (দারবান্দ) অভিযান

---

[১] (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১১, পৃ. ৫৫–৬২; (খ) ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ১০; (গ) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৬, পৃ. ৬৫–৬৬; (ঘ) আবদুল মাজিদ দারয়াবাদী, *তাফসীরে মাজিদী*, পৃ. ৬২০–৬২১

[২] আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২১৪–২১৫

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৯৮

[৪] (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৬৪১–৬৪২; (খ) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৭

পরিচালনার নির্দেশ দেন। সুরাকা (রাযি.) মূল অভিযান পরিচালনার পূর্বে আবদুর রহমান ইবনে রাবীআকে অগ্রবর্তী সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান যখন আরমেনীয় অঞ্চলে পৌঁছেন তখন এলাকার শাসনকর্তা শহরবরায় যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি বাবুল আবওয়াব অভিমুখে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিলেন। এ মুহূর্তে শহরবরায় তাঁকে বললেন, আমি যুল কারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্য একজন লোক পাঠিয়েছিলাম। সে আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবে। অতঃপর লোকটিকে সেনাপতি আবদুর রহমানের নিকট হাযির করা হয়, সে প্রাচীর এবং এর সন্নিহিত এলাকার মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদান করেন।[১]

ইয়াজূজ-মাজূজ প্রসঙ্গ

ইয়াজূজ-মাজূজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইয়াফিস ইবনে নূহ (আ.)-এর বংশধর। ইউরোপীয় ভাষায় ইয়াজূজ Gog আর মাজূজ Magog নামে পরিচিত।[২] এশিয়ার উত্তরে তিব্বত-চীন হয়ে ককেশাস প র্তমলার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাদের অধিবাস। হিযকীলের সহীফা (অধ্যায়ঃ ৩৮–৩৯) অনুযায়ী রাশিয়া ও মস্কোর অধিবাসিগণই হচ্ছে ইয়াজূজ ও মাজূজ। ইসরাঈলী ইতিহাসবিদ ইউসিফুস ইয়াজূজ-মাজুজ বলতে সিনমিনিঈন জাতি-গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন, যারা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাস করে।[৩] খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০ সালে এদের একটি বিশাল বাহিনী পর্বত চূড়া হতে নেমে ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় জনপদ লণ্ডভণ্ড করে দেয়।[৪] ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা উদীয়মান সূর্য ও নীল আকাশের পূজারি। তবে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।[৫] তাদের মধ্যে মূল পার্বত্য অঞ্চলে যারা বাস করত তারা ছিল বর্বর, অসভ্য, হিংস্র ও যালিম। কিন্তু যারা নৃতাত্ত্বিকভাবে একই জাতি-গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও সভ্যতার পরশে সমতলবাসীদের সাথে আধুনিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা এ নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

[১] (ক) আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ. ৪, পৃ. ১৫৫–১৫৭; (খ) ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ১৩৮–১৪০; (গ) ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৩০৩–৩০৬

[২] হিফযুর রহমান সিওহারবী, *কাসাসুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১৮৪

[৩] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৬

[৪] হিফযুর রহমান সিওহারবী, *কাসাসুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১৯০

[৫] মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৬৩৩

মোগল, তুর্কি, তাতার ও মঙ্গোলীয়রা ইয়াজূজ-মাজূজের অধস্তন পুরুষ। মাজোলিয়া বা ককেশাসের সেসব গোত্র যখন তাদের কেন্দ্রে থাকত তখন তারা ইয়াজূজ-মাজূজ। সেখান হতে বের হয়ে শত শত বছরব্যাপী সভ্য জগতে সমাজবদ্ধ জীবনে বসবাস করার পর তাদের হিংস্রতা ও বর্বরতা কিছুটা লোপ পায়। কেন্দ্রের সাথে তাদের আর যোগাযোগ থাকেনি, এমনকি একে অপরের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে যায়।[১]

শায়খ আবুল হাসান ইবনুল আসীর (রহ.) বলেন, ইয়াজূজ-মাজূজ তাতারীদের সমগোত্রীয় হলেও শক্তি, নিপীড়ন ও অরাজকতা সৃষ্টির যোগ্যতা তাতারীদের তুলনায় ইয়াজূজ-মাজূজের বেশি।[২]

ইয়াজূজ-মাজূজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। তিব্বত ও চীন হতে ককেশাসের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত ছিল তাদের আক্রমণস্থল।[৩]

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইয়াজূজ-মাজূজের ২২টি গোত্রের মধ্যে ২১টি গোত্রকে যুল কারনাইন প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যে গোত্রটি প্রাচীরের বাইরে রয়ে গেছে তারা হল তুর্কি। এ তুর্কি-তাতারী ফিতনা ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করে দেয়। চেঙ্গিস খানের আক্রমণে মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান সভ্যতার লীলাভূমি বাগদাদ বিধ্বস্ত করে দেয়। বাগদাদের ২০ লাখ জনবসতির মধ্যে ১৬ লাখ মোঙ্গলদের হাতে প্রাণ হারায়। ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (রহ.)-এর মতে এরাই হল ইয়াজূজ-মাজূজের অগ্রবর্তী সেনাদল, সরাসরি ইয়াজূজ-মাজূজ নয়। কারণ হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াজূজ-মাজূজ আসতে পারে না।[৪]

আল্লামা মাহমূদ আল-আলূসী (রহ.) তাতারীগণ যে ইয়াজূজ-মাজূজ তা স্বীকার করেন না, তবে তাতারী ফিতনা ও ধ্বংসযজ্ঞকে ইয়াজূজ-মাজূজের বর্বরতা ও হিংস্রতার সমতুল্য বলে মনে করেন।[৫]

ইয়াজূজ-মাজূজের দলবদ্ধভাবে পর্বত হতে নেমে লোকালয়ে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ধ্বংসলীলা চালায়। তাদের উৎপীড়ন ও বর্বরতা থেকে বাঁচার জন্য

---

[১] হিফযুর রহমান সিওহারবী, *কাসাসুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১৯৪

[২] ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, দ খ. ১, পৃ. ৪৮

[৩] মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৮২৪

[৪] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১১, পৃ. ৫৮

[৫] আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী*, খ. ৮, পৃ. ৩৫৮

পৃথিবীর বহু জায়গায় বড় আকারের প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। যুল কারনাইন ককেশাসের দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে লোহা ও তামার গলিত প্রাচীর তৈরি করার পূর্বে ইয়াজূজ-মাজূজ, যারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ৪ লাখ, লোকালয়ে আক্রমণ চালিয়ে গাছপালা ধ্বংস করে দিত, ফসল ও তরকারি সাবাড় করে ফেলত, শুকনা দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করত। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ হতে শিশুরাও রেহাই পেত না।[১] যুল কারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হওয়ার ফলে ইয়াজূজ-মাজূজের সেসব সম্প্রদায় ওপারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, কিয়ামত দিবসের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা সেখানে আবদ্ধ থাকবে। হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করে দাজ্জালকে যখন নিধন করবেন, তখন ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব ঘটবে। যুল কারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতল ভূমির সমান হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝

'যখন ইয়াজূজ-মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হবে, তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে দ্রুত ছুটে আসবে।'[২]

ইয়াজূজ-মাজূজ মুক্ত পঙ্গলালের মতো একযোগে পার্বত্য এলাকা হতে বের হয়ে দ্রুতগতিতে সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ভয়ানক নিপীড়ন চালিয়ে মানুষের রক্ত নিয়ে তারা হোলি খেলবে। তাদেরকে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও থাকবে না।[৩]

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে তুর পর্বতে সুরক্ষিত কেল্লায় আশ্রয় নেবেন। এ বর্বর জাতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী, আসবাবপত্র এবং নদীর পানি নিঃশেষ করে দেবে। তাদের আক্রমণ অভিযানে জনবসতি বিরান হয়ে যাবে। অবশেষে হযরত ঈসা (আ.)-এর দু'আর বরকতে অত্যাচারী ইয়াজূজ-মাজূজের অগুণতি লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে পৃথিবীতে বসবাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে। আল্লাহ পাক লাশগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন অথবা অদৃশ্য করে দেবেন এবং বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধৌত করে পরিষ্কার করে দেবেন।[৪] অতঃপর ৪০ বছর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

---

[১] (ক) ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ১০; (খ) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৬, পৃ. ২৬৬-২৬৮

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৯৬

[৩] শাব্বির আহমদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী*, পৃ. ৪৩৯

[৪] মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৮২৪

যুল কারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ ২২৭-২৩৩ হিজরী সালে যুল কারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত তা খুঁজে বের করার জন্য সাল্লাম আত-তরজমানের নেতৃত্বে ৫০ সদস্যের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। দু'বছরের বেশি সময় তারা দেশের পর দেশ সফর করে অবশেষে উক্ত প্রাচীরের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হন, যা লোহা ও তামা দিয়ে নির্মিত। তারা দেখতে পান যে, নিচে বিশাল আকারের দরজা রয়েছে এবং দরজাটি বড় বড় তালা দ্বারা আবদ্ধ। প্রাচীরটি অত্যধিক উঁচু, শত চেষ্টা করেও উপরে উঠা সম্ভব নয়। উভয় দিক দিয়ে বিশাল পর্বতশ্রেণী সমান্তরাল রেখায় বহুদূর চলে গেছে। প্রাচীরের সন্ধান পেতে তাদের দু'বছর সময় লেগেছিল।[১]

সমাজবিজ্ঞানী আবদুর রহমান ইবনে খালদূন (রহ.) যুল কারনাইনের প্রাচীর এবং এর অবস্থান সম্পর্কে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিম দিকে তুর্কিদের কানজাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্ব দিকে ইয়াজূজ-মাজূজের বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। এ পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্ব দিকে অবস্থিত, ভূমধ্যসাগর হতে শুরু হয়ে এ ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর হতে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিম খণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এ জায়গা হতে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌঁছে তা দক্ষিণ হতে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এ পর্বতমালার মধ্যস্থলে সিকান্দারী প্রাচীর অবস্থিত যার সংবাদ পবিত্র কুরআন প্রদান করেছে।[২]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) যুল কারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, দুস্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন হতে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে একটি নয়, বরং বহু প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এসব বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেন। এর মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর।[৩] শায়খ আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী (রহ.)-এর মতে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ মাইল এবং নির্মাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট ফাগফুর। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে অবতরণের ৩৪৬০ বছর পর চীনের প্রাচীর নির্মিত

---

[১] (ক) ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ১১; (খ) ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ. ২১, পৃ. ৪৯৮

[২] (ক) ইবনে খালদুন, *দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী তারীখিল আরব ওয়াল বারবার ওয়া মিন আসিরিহিম মিন যাওয়ীশ শানিল আকবর*, খ. ১, পৃ. ৯৯; (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাজারিফুল কুরআন*, পৃ. ৮২৬

[৩] আল কাশ্মীরী, *ফয়যুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৪, পৃ. ৩৫৩

হয়। এ প্রাচীরকে মোগলরা আনকূওয়াহ (أَنْكُوَة) ও তুর্কিরা বূকূকাহ (بُوقُوقَة) বলে অভিহিত করে থাকে। এ ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর অনারব বাদশাহগণ নির্মাণ করেন, যেগুলো উত্তর দিকে অবস্থিত।[১]

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াজূজ-মাজূজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকরীরা এবং তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরা ছিল তাদের সার্বক্ষণিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ইয়াজূজ-মাজূজের আগ্রাসন হতে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর।[২]

দ্বিতীয় প্রাচীরঃ মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকট অবস্থিত। এর অবস্থান স্থলের নাম 'দারবান্দ'। এ প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোঙ্গল বীর তৈমুর লঙয়ের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোমান সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বরজর জার্মানি তাঁর গ্রন্থে এর উল্লেখ করেন। স্পেনের সম্রাট ক্যাহাইলের দূত ক্ল্যামসু তার ভ্রমণবৃত্তান্তে এ প্রাচীরের বর্ণনা দেন। ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুর লঙয়ের দরবারে পৌছেন তখন এ প্রাচীর অতিক্রম করেন। তিনি লিখেছেন, বাবুল হাদীদের প্রাচীর মাওসিলের সেই পথে অবস্থিত যা সমরকন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।[৩]

তৃতীয় প্রাচীরঃ মাওলানা আবদুল মাজিদ দারিয়াবাদী (রহ.) মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অংশে হাসার জেলায় আরেকটি দারবান্দের উল্লেখ করেন। এটি বুখারা হতে ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, ৩৮ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ৬৭ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে। ইউরোপীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো এ প্রাচীরের কথা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেন।[৪]

চতুর্থ প্রাচীরঃ রাশিয়ার দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দারবান্দ ও আবওয়াব নামে খ্যাত। দারবান্দ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন দাগিস্তানের একটি শহরের নাম, যা কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি তিন ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ হতে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৪৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটিকে 'দারবান্দ নওশেরওয়াঁ' নামে অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল আবওয়াব নামে এটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ইতিহাসবিদগণের মতে এর চারপার্শ্ব প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং এটিকে

---

[১] আল-কাশ্মীরী, *আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলায়হিস সালাম*, পৃ. ১৯৮

[২] হিফযুর রহমান সিওহারবী, *কাসাসুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১৫১–১৫৯

[৩] তানতাবী, *আল-জাওয়াহিরু ফী তাফসীরিল কুরআন আল-করীম*, খ. ৯, পৃ. ১৯৮

[৪] আবদুল মাজিদ দারিয়াবাদী, *তাফসীরে মাজিদী*, পৃ. ৬২০

'আবওয়াবুল আলবানিয়া' ও 'বাবুল হাদীদ' বলা হত। কারণ প্রাচীরে বড় বড় লৌহ ফটক রয়েছে।[১]

পঞ্চম প্রাচীরঃ বাবুল আবওয়াব হতে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দু'পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে প্রসিদ্ধ একটি গিরিপথ রয়েছে। এ পঞ্চম প্রাচীরটি কাফ্কায অথবা জাবালে কোফা অথবা কাফ্ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন, বাবুল আবওয়াব প্রাচীরের সন্নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের হাত হতে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছিল। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেউ কেউ আলেকজান্ডার, কেউ কেউ সম্রাট নওশেরওয়াঁর নাম উল্লেখ করেন। শায়খ ইয়াকূত আল-হামাবী (রহ.) বলেন, গলিত তাম্র দ্বারা তা নির্মিত।[২]

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী (রহ.) বলেন, এসব প্রাচীর উত্তর দিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত। তাই এসবের মধ্যে যুল কারনাইনের প্রাচীর কোনটি তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারে অধিক মতভিন্নতা দেখা দেয়। কেননা উভয় স্থানের দারবান্দ এবং উভয় স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত পাঁচটি প্রাচীরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এটি যুল করনাইনের প্রাচীর নয়, এ ব্যাপারে সবাই একমত। এটি উত্তর দিকে নয়, দূর প্রাচ্যে অবস্থিত। কুরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা দেখা যায় যে, যুল কারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত। এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত ৩টি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। এর মধ্যে আবুল হাসান আলী আল-মাসউদী (রহ.), আবু ইসহাক আল-ইসতাখরী (রহ.) ও ইয়াকূত আল-হামাবী (রহ.) প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুল কারনাইনের প্রাচীর বলে অভিহিত করেন যা দাগিস্তানে অথবা ককেশাস এলাকা বাবুল আবওয়াবের দারবান্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযের দারবান্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুল কারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তাঁরা সম্ভবত দারবান্দ নামের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এখন যুল কারনাইনের প্রাচীরের অবস্থান প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে।

---

[১] (ক) আল-বুস্তানী, *দায়িরাতুল মাআরিফ*, খ. ৭, পৃ. ৬৫১; (খ) ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৩০৩-৩০৬

[২] (ক) আল বুস্তানী, *দায়িরাতুল মাআরিফ*, খ. ৭, পৃ. ৬৫২; (খ) ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৩০৩-৩০৬

১. দাগিস্তান ককেশাসের এলাকা বাবুল আবওয়াবের দারবান্দের প্রাচীর।
২. আরও উচ্চে কাফ্‌কায অথবা কাফ্ অথবা ককেশাস (Caucasus) পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর।

উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের নিকট প্রমাণিত সত্য। উভয় প্রাচীরের মধ্যে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত দারিয়ালের দু'সুউচ্চ পর্বতের গিরিপথে লোহা ও তামা নির্মিত প্রাচীরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইনের প্রাচীর বলে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.), আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ.) প্রমুখ অভিমত ব্যক্ত করেন।[১]

যুল কারনাইনের পূর্ণ জীবনই ছিল আল্লাহর দীনের পথে মেহনত, মানব-সেবা, ত্যাগ ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনপথের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ৫শ' বছর রাজত্ব করার পর যুল কারনাইন ইন্তিকাল করেন। দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তাঁর লোহা-তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত প্রাচীর অনন্ত কাল ধরে তাঁর স্মৃতির অম্লান সাক্ষী হয়ে থাকবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَلَمَّا فَاتَهُ عَيْنُ الْحَيَاةِ وَحُظِيَ بِهَا الْخَضِرَ ﷺ، اغْتَمَّ غَمًّا شَدِيْدًا، فَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، فَمَاتَ بِدُوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ، هٰكَذَا رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

'হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত, অমৃত-ঝর্ণা যখন হযরত যুল কারনাইনের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং হযরত খিযির (আ.) তা লাভ করে ধন্য হলেন, তখন তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন। দুমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় তিনি ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁর অন্তিম বিশ্রামস্থল।'[২]

মূল্যায়ন

যুল কারনাইন ছিলেন ধর্মপ্রচারক ও শক্তিধর শাসক। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন ও পরিভ্রমণের শক্তি দান করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শক্তিধর শাসক হিসেবে তিনি

---

[১] হিফযুর রহমান সিওহারবী, *কাসাসুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১৫১-১৫৯; (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৮২৬-২৮৭; (গ) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *তারজুমানুল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৪৬২-৪৬৪; (ঘ) *Encyclopaedia Britannica*, I Ith ed, Vol, xiii, p. 526

[২] আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহ সহীহিল বুখারী*, ক. ১৫, পৃ. ২৩৩

অত্যাচারীদের নির্যাতন-নিবর্তণ থেকে অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করেন। সামাজিক দুর্নীতি দমনে ব্যবস্থা নেন। সমাজে আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধান জারী করেন। জনগণের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করেন এবং দুর্বৃত্ত ও অপরাধীদের শায়েস্তা করেন। আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে নিরীহ জনগণকে রক্ষাকল্পে তিনি যে লাটীর নির্মাণ করেন, এতে সাধারণ জনগণের সহায়তা গ্রহণ করেন। এতে জাতীয় সমস্যা সমাধানে জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় সম্পৃক্ততা যে অতি জরুরি তিনি তা অনুধাবন করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আল-আইনী : বদরুদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল-আইনী (৭৬২–৮৫৫ হি. = ১৩৬১–১৪৫১ খ্রি.), *উমদাতুল কারী শরহ্ সহীহিল বুখারী*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান

৩. আল-আলুসী : আবুস সানা, শিহাবুদ্দীন, মাহবুদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুসাইনী আলা-আলূসী (১২১৭–১২৭০ হি. = ১৮০২–১৮৫৪ খ্রি.), *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাব'উল মাসানী*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৪. আল-আসকালানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকালানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), *ফতহুল বারী শরহ্ সহীহ আল-বুখারী*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

৫. আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী: আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী (১৩০৯–১৩৯৬ হি. = ১৮৯২–১৯৭৭ খ্রি.), *তাফসীরে মাজিদী*, পাক কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান

৬. আবু হাইয়ান আল-আনদালুসী: আসীরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আল-আনদালুসী (৬৫৪–৭৪৫ হি. = ১২৫৬–১৩৪৪ খ্রি.), *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৭. আবুল আ'লা মওদুদী : সাইয়েদ আবুল আ'লা আল-মওদুদী (১৩২১–১৩৯৯ হি. = ১৯০৩–১৯৭৯ খ্রি.), *তাফহীমুল কুরআন*, ইদারায়ে তারজুমানুল কুরআন, লাহোর, পাকিস্তান (১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৮. আবুল কালাম আযাদ : মাওলানা, আবুল কালাম, মুহ্য়ুদ্দীন ইবনে খয়রুদ্দীন আহমদ আযাদ (১৩০৬–১৩৭৭ হি. = ১৮৮৮–১৯৫৮ খ্রি.), *তারজুমানুল কুরআন*, ইসলামি একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান

৯. আহমদ আলী সাহারানপুরী: আহমদ আলী সাহারানপুরী (০০০–১২৯৭ হি. = ০০০–১৮৭৯ খ্রি.), *আল-হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী*, কদীমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৮১ হি. = ১৯৬১ খ্রি.),

॥ই॥

১০. ইবনুল আসীর : ইয্যুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী আশ-শায়বানী (৫৫৫–৬৩০ হি. = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), *আল-কামিল ফিত তারীখ*, দারু সাদার, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৮ হি. = ১৯৬৮ খ্রি.)

১১. ইবনে আবু হাতিম : আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০–৩২৭ হি. = ৮৫৪–৯৩৮ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকাররমা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১২. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ইতিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ভারত (দ্বাদশ সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১৩. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*,

দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণঃ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৪. ইবনে খালদুন : আবু যায়দ, অলীউদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল-খাযরমী আল-ইশবীলী (৭৩২-৮০৮ হি. = ১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.), *দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী তারীখিল আরব ওয়াল বারবার ওয়া মিন আসিরিহিম মিন যাওয়ীশ শানিল আকবর = তারীখু ইবনি খলদুন*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণঃ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৫. ইয়াকুত আল-হামাবীঃ আবু আবদুল্লাহ, শিহাবুদ্দীন, ইয়াকূত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রূমী আল-হামাবী (৫৭৪-৬২৬ হি. = ১১৭৮-১২২৯ খ্রি.), *মু'জামুল বুলদান*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

॥ক॥

১৬. আল-কাশ্মীরী : মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনু মুআয্যম শাহ আল-কাশ্মীরী (১২৯২-১৮৭৫ হি. = ১৩৫৩-১৯৩৪ খ্রি.), *ফয়যুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

১৭. আল-কাশ্মীরী : মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনু মুআয্যম শাহ আল-কাশ্মীরী (১২৯২-১৮৭৫ হি. = ১৩৫৩-১৯৩৪ খ্রি.), *আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলায়হিস সালাম*, মাতবায়ে কাসিমী দেওবন্দ, ইউপি, ভারত

১৮. আল-কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি. = ১২০৪-১২৭৩ খ্রি.) *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. = ১৯৬৪ খ্রি.)

॥ত॥

১৯. আত-তাবারী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, দারু হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

২০. আত-তাবারী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ খ্রি.)

২১. তানতাবী : হাকীমুল ইসলাম, অধ্যাপক তানতাবী ইবনে জাওহারী (১২৮৭–১৩৫৮ হি. = ১৮৭০–১৯৪০ খ্রি.), *আল-জাওয়াহিরু ফী তাফসীরিল কুরআন আল-করীম*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (প্রথম সংস্করণঃ ১৩৪৬ হি. = ১৯২৮ খ্রি.)

॥ফ॥

২২. ফখরুদ্দীন আর-রাযী : ফখরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তায়মী আর-রাযী (৫৪৪–৬০৬ হি. = ১১৫০–১২১০ খ্রি.), *মাফাতীহুল গায়ব = আত-তাফসীরুল কবীর*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণঃ ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ব॥

২৩. আল-বাগাবী : রুকনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মাস'উদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফার্‌রা আল-বাগাবী আশ-শাফিয়ী (৪৩৬–৫১০ হি. = ১০৪৪–১১১৭ খ্রি.), *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস

আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

২৪. আল-বুস্তানী : বুতরুস ইবনে বূলস ইবনে আবদুল্লাহ আল-বুস্তানী (১২৩৪–১৩০০ হি. = ১৮১৯–১৮৮৩ খ্রি.), *দায়িরাতুল মাআরিফ*, মাতবাআতুল মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান (১৩০০ হি. = ১৮৮৩ খ্রি.)

॥ম॥

২৫. আল-মহল্লী ও আস-সুয়ুতী: জালাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মহল্লী (৭৯১–৮৬৪ হি. = ১৩৮৯–১৪৫৯ খ্রি.) ও জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.),

২৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী : মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা শরীফ, সউদী আরব

২৯. শাব্বির আহমদ উসমানী : শায়খুল ইসলাম, শাব্বির আহমদ ইবনে ফযলুর রহমান উসমানী দেওবন্দী (১৩০৫–১৩৬৯ হি. = ১৮৮৭–১৯৪৯ খ্রি.), *তাফসীরে উসমানী*, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, মদীনা শরীফ, সউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

॥স॥

৩০. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী: মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী আল-উসমানী আল-মাযহারী (১১৪৩–১২২৫ হি. = ১৭৩০–১৮১০ খ্রি.), *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

॥হ॥

৩১. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৩২. হিফযুর রহমান সিওহারবী: হিফযুর রহমান ইবনে শামসুদ্দীন সিওহারবী (১৩১৮–১৩৮১ হি. = ১৯০১–১৯৬২ খ্রি.), *কাসাসুল কুরআন*, দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর
ইতিহাস চর্চা
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন